দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 11 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সার্বিক নিরক্ষরতামুক্তি কতদূর?

আমাদের মতো দরিদ্র, ব্যাপক নিরক্ষরতার দেশে শিক্ষা প্রাথমিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি বিষয়। শিক্ষার ব্যাপারে সরকারীভাবে সব আমলে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি তথা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আমলে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচী। এসবের কোন ফল যে পাওয়া যায়নি বা যাচ্ছে না তা নয়, তবে এসবে আকাঙ্ক্ষিত ফল যে পাওয়া যায়নি, তা অস্বীকার করা যাবে না।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্দশা অনেক দিনের। এ দুর্দশার পিছনে কারণও অনেক। নানা পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাফল্য পাওয়া গেলেও সামগ্রিকভাবে এই দুর্দশা ঘোচেনি এখনও, এখনও হাজারো সমস্যা, সঙ্কট এবং তার পাশাপাশি দুর্নীতি শিক্ষার উন্নয়নের গতিতে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। নিরক্ষরতা ব্যাপক বলেই দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা এখনও অনেক। তেমনি এই পর্যায়ে শিক্ষার মানও আশানুরূপ নয় মোটেই। সবার জন্য শিক্ষা, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ইত্যাদি প্রকল্প ও স্লোগান বিভিন্ন সময়ে নেয়া হয়েছে। আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার কথাও শোনা গেছে। এই লক্ষ্যটি যথাযথভাবে যথাসময়ে পূরণ হবে কিনা তা নির্ভর করছে এখনকার কাজের ওপর। তবে স্বাধীনতার তিন দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও এখনও যা দেখা যাচ্ছে তা হলো, আজও আমাদের দেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়নি, সাক্ষর করা যায়নি দেশের মানুষকে। দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করার কাজ কিভাবে এগোচ্ছে সেটা বোঝা যায় সাক্ষরতার হার দেখে। দেশে সাক্ষরতার হারের ব্যাপারে গত প্রায় এক যুগ ধরে সরকারীভাবে যে সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, এখন একটি বেসরকারী সংস্থা সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট দ্বিমত পোষণ করেছে। সরকারীভাবে সাক্ষরতার হার ৬৫ দশমিক ৫ ভাগ দাবি করা হলেও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বলেছে, এই দাবি সঠিক নয়, তথ্যভিত্তিক নয়। এই গ্রুপটি মাঠপর্যায়ে জরিপ ও গবেষণা চালিয়ে দেশে সাক্ষরতার হার পেয়েছে শতকরা ৪২ ভাগ। 'আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি ও দুস্তর চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ১১ থেকে ২০ বছর বয়সের দেড় কোটি কিশোর ও তরুণ প্রাথমিক শিক্ষা ও ব্যবহারযোগ্য সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হলেও গড়ে প্রতিশিশুর পরিবারকে বছরে অন্তত এক হাজার টাকা খরচ করতে হয় শিক্ষার উপকরণ ও প্রাইভেট পড়ার জন্য। গত এক দশকে প্রাথমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও ছয় থেকে ১০ বছরের শতকরা ৪০ ভাগ শিশু এখনও পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। যারা ভর্তি হয় তাদের এক-চতুর্থাংশ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। শিক্ষা বিস্তার তথা সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত সকল উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য নিরক্ষরতা দূর করা, শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা। নিরক্ষরতামুক্ত দেশ এবং শিক্ষিত জাতি গড়তে হলে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রাথমিক শিক্ষার ওপরই দিতে হবে। কিন্তু আমাদের এই স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাল এখনও করুণ। শিক্ষার জন্য বিপুল বরাদ্দ, নানা স্লোগান, প্রচারণা, উদ্যোগ এবং উৎসাহব্যঞ্জক বিভিন্ন পরিকল্পনার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগের ফলে স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেড়েছে। সাক্ষরতাও সামগ্রিকভাবে বেড়েছে; কিন্তু এখনও হাজার হাজার শিশু স্কুল থেকে বহু দূরে। দেশের বহু গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত নেই।

অন্যদিকে বেসরকারী বহু স্কুলের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কোনটার জানালা নেই, কোনটার ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে, কোনটাতে বসার বেঞ্চি পর্যন্ত নেই। দরিদ্র পরিবারের বহু শিশু বাবা-মাকে দুটো পয়সা উপার্জনে সাহায্য করে বলে স্কুলে যাওয়ার গরজ তাদের নেই। দেশে ব্যাপক দারিদ্র্য এর প্রধান একটি কারণ; একই সঙ্গে পিতামাতার নিরক্ষরতাও এর পিছনে রয়েছে। নিরক্ষরতা দূর করা ও সর্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে প্রতিটি গ্রামে জনপদে অন্তত একটি করে প্রাথমিক স্কুল গড়া প্রয়োজন। বেসরকারী উদ্যোগে কেউ স্কুল করতে চাইলে তাদের সম্ভাব্য সর্ববিধ সহযোগিতা দিয়ে উৎসাহিত করা উচিত। দেশের সকল শিশু যাতে স্কুলে যাওয়ার সহজ সুযোগ পায় এবং অন্তত প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে সেই অবস্থা ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া সার্বিক নিরক্ষরতামুক্তি সম্ভব নয়।